পারমিতা ভৌমিক

কবি অলোকরঞ্জনের কবিতা : অন্তর্জ্ঞান, মেধা ও মননের সিগনেচার

অলোকরঞ্জনের যাওয়া নেই। তাঁর কবিতাশিল্পে যে অন্তর্জ্ঞানের প্রাধান্য রয়েছে তাই তাঁকে চিরন্তনতা দেবে। এই অন্তর্জ্ঞানের সঙ্গেই মিশেছে তাঁর প্রাতিভতার অন্তর্প্রেরণা।

একদিকে প্রস্ফুট জ্ঞান অন্যদিকে প্রস্ফুট প্রাণ—দুই এর অবস্থানে অলোকরঞ্জনের কবিতা অনন্যতার দাবি রাখে।

ভারতের ঋষিদৃষ্টির সঙ্গে পশ্চিমের প্রেরণার মিশ্রণে এমনটা সম্ভব হয়েছে।

আমার সমকালে অলোকরঞ্জন একটি বিরল প্রতিভা। মিথ ব্যবহার ও আর্ট-ডিমিথ তাঁর কবিতাকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে একটি আলোচনায় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত স্বয়ং বলেছিলেন "কোনো কবিকেই কেউ কখনোই সমগ্রভাবে ছুঁতে পারে না"— তাই একই সময়ে পাশাপাশি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও অলোকরঞ্জন,দুজনেই কবিতা লিখলেও কিন্তু সুনীলের তুলনায় অলোকরঞ্জন কম পঠিত রয়ে গেছেন।আমরা কিন্তু এখানে, এই প্রবন্ধে, অলোকরঞ্জনের কবিতা ও কবিত্বকে ছুঁতেই এসেছি।

রামতনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারণা সমকালীন বাংলায় সমাজ জীবনে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলেছিল তার কোন অভিঘাত অলোকরঞ্জনকে তেমন স্পর্শ করেনি। কিন্তু আমরা মনে করি কেবলমাত্র সমাজচেতনাই কোন ঋষিকবির একমাত্র গুণ নয়। সেটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলেও কবিতা সত্যিকার কবিতা হয়ে ওঠার পক্ষে অনিবার্য কোনো বৈশিষ্ট্য নয়। আবার এও ঠিক সমাজ সচেতনতা থাকলেও সত্যিকার কবিত্ব গুণে অনেক ক্ষেত্রেই সেসব কবিতা চিরন্তন কবিতা হয়ে উঠতে পেরেছে।

অলোকরঞ্জন প্রবাসী কবি, তবু লক্ষণীয়ভাবে বাংলার কেবলমাত্র কাব্যসাহিত্যই তাঁর হৃদয়টি অধিকার করেছিল। তিনি নির্জনতম মানুষ। এই নির্জনতাই এক ধরনের অজ্ঞাতবাস যা কবিদের ক্ষেত্রে একান্ত জরুরী। নির্জনতাকে, সেভাবে দেখতে গেলে তাকেই একটি চমৎকার কাব্য আঙ্গিক বলবো। নির্জনতার মধ্যেই কবির মনের ভাবটি রূপ পরিগ্রহ করে এবং সেটিকে জনচেতনায় "Inculcate" করাই কবির কাজ। আমরা দেখেছি অলোকরঞ্জন দূর-আকাশের তারার মত। সেই তারার আলোই সেখান থেকে অলোকের দিকে অভিসরণ করেছে।

কবি গটফ্রীড বেন-এর উক্তিকে মনে রেখে আমরা বলতে পারি শ্রেষ্ঠ কবির কাছে সব শুদ্ধ পাঁচটি শুদ্ধ কবিতা আর আমরা আশা করব, —যদি এই মতকে মানদণ্ড হিসেবে ধরি তবে অনায়াসে বলা যায় অলোকরঞ্জন অসংখ্য কবিতায় নিজের উত্তীর্ণতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। তিনি আত্মগত, প্রায় নীরব এক কবি। স্বগতোক্তির মতো করেই নিজেকে

তিনি চিনিয়ে দিচ্ছেন পাঠকসমাজে। এও এক ধরনের প্রকৃতিলীন লোকরঞ্জনকে পাওয়া বটে । পাঠক ধন্য। রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কাব্যে অলোকরঞ্জন নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

তাঁর বলার ভঙ্গিটি তুলনা বিরল। বিষয় বৈচিত্র্যে তাঁর কাব্যজগৎ সমৃদ্ধ। তাঁর ভাষা সুসংস্কৃত। অনেকের মতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার আবেদন মেদুর ও মনোময়, আবার কোথাও ধ্রুপদী মেলোড্রামাটিক। কিন্তু বেশি ক্ষেত্রেই একান্ত স্বগত ও মৃদু। আদ্যোপান্ত মন ও পাঠককে টেনে রাখার মতো মনন সেখানে রয়েছে।

অলোকরঞ্জনের প্রথম দিকের কবিতায় ছন্দের অন্তমিলের প্রবণতা দেখা যায়—

"এইভাবে প্রতিদিন বুধুয়ার ডাকে/কানায়-কানায়
আলো পথের কলসে ভরা থাকে/ঝাঁকে ঝাঁকে
পাখি আসে, কেউ তার দিদি, কেউ মাসি
রূপোলি ডানায় যারা নিয়ে যায় বুধুয়ার হাসি' (বুধুয়ার পাখি)

একটা সহজ সুন্দর ছবিতে ধরা পড়েছে একটি পরাবাস্তব জগৎ। ধরা রয়েছে একটা পর্যবসিত অতীত, নিষ্প্রাণ। প্রকৃতির আদিতম বন্ধু এইসব পাখি কেউ দিদি কেউ মাসি যাদের রুপোলি ডানায় উড়ে চলে মানুষের হাসি। এই পাখিরাই কেমন যেন আলগোছে ঢুকে পড়েছে মনের বিতানে। কবি এখানে একান্তই প্রকৃতিগত। কখনও কখনও মনে হয় কবির "নিভৃত" নিজে হাতে লিখেছে যে নাম সেই নাম মুছে যেতেই কবি পেয়েছেন একটা অদ্ভুত বিশ্বগত বেদনা।

অলোকরঞ্জনের ওপর বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। সেখানে দেখেছি এক বুদ্ধ পূর্ণিমার রাতে তপস্বিনী সুজাতা খুঁজে পেয়েছে তার গতজন্মের ঈশ্বরকে। এই বুদ্ধ চেতনার সুর ধ্বনিত হয়েছে এক অব্যক্ত আশাবাদে,—

"মনে হলো এখানে আবার/তোমার সময় থেকে বহুদূর শতাব্দীর তীরে/জয়শ্রী জীবন পাবো ফিরে/ফিরে পাবো পরশ।"

কবির মনে সংগুপ্ত কোনো নারী অতি সংগোপনে সুজাতা হয়ে উঠেছেন কিনা কে জানে! ওই নারীই আবার চৈতন্যের দাঁড়ে এসে বসে এবং বলে অসংবৃত অন্তরের কথা। তখন নিরুচ্চার ভাষায় দূরাগত ভ্রমরগুঞ্জনের মত কবি বলেন—"এ জন্মে জানিনা—তবু আর জন্মে আনন্দ ছিলাম"।

আমরা আগেই বলেছি অলোকরঞ্জন ধ্রুপদী কবি, কাজেই তাঁর কবিতার স্বল্পপরিসরে কবিতাগুলো মানুষের চিরন্তন ইচ্ছা ও ইচ্ছাপূরণের মধ্যে একটা অদ্ভুত তফাৎ সৃষ্টি করেছে এবং সেটিই একটা গোপন বেদনার উৎস হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ অলোকরঞ্জনের বুদ্ধচেতনা আজকে যেন স্বয়ং কবির মনেই সৃষ্টি করেছে ব্রতভ্রষ্ট ভিক্ষুকের জরাজীর্ণ বেদনা—

"যুগে যুগে জন্ম ভর- জ্বালা
পার হয়ে নিয়ে যাবে
প্রভুর মৈত্রীর ঝরামালা

অগৌরবে স্থাণু গতব্রত ভিক্ষুকে দেখে ব্যথাদীর্ণ সুজাতা জ্বালাময়ী হয়ে ওঠে—

"তারপর চলে যেতে যেতে/তাকালো বিষণ্ণচোখে দরিদ্র ধূসর ধানখেতে/বৃষ্টির বাসনা যেন কৃষাণীর দু'নয়নে কালো/বিপুল বিস্ময়ে শুধালাম বলে যাও কি তোমার নাম?/ আবার ভ্রূযুগে তার ভ্রুকুটি আগুন ঘনালো

"এ জন্মে জানিনা —তবু আর জন্মে সুজাতা ছিলাম"।

প্রবাসী কবি বাংলা ভাষার প্রতি মমতায় যখন উদ্বেল, সুদীর্ঘ প্রবাসে যখন ফিরে তাকিয়েছেন নিজের ভাষার প্রতি, তখন আমরা পেলাম "যৌবন বাউল" কাব্যটি। "মায়ের জন্মদিনে" "কবিতায় তাই লক্ষ্য করি কবির মায়াময় আবেদন—

"আমার চেতনা তাই বেদনারই এক নামান্তর/আমারি জীয়নমন্ত্রে জীবন মৃত এইযে প্রান্তর/সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা ফুল্ল সুষমায় কাল যদি ভরে ওঠে, তবে তার নিহিত ভাস্বর /যে অমৃত সে তো তুমি আজো যার অপার ক্ষমায় পৃথিবীকে বুকে টানি"।

ভাষা শিল্পের মিত ব্যবহারে কবির সাফল্য প্রশ্নাতীত। পৌরাণিক প্রতীকে তিনি ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। সেসব ব্যক্তিক হয়েও বিশ্বগত হয়ে গেছে। প্রতিভার এই সার্বভৌমত্ব অলোকরঞ্জনকে অগ্রগণ্য কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে—

"মহেশ্বর জাগি আমি, অতন্দ্রিত পদ্মবীজ মালা
এখনো গৌরীর হাতে, আমি তার বিষণ্ণ নিরালা
দুই হাতে অঞ্জলি ক'রে আমারি আকাশে দিই, তুমি যার উদ্ভাসিত উষা:
তামসী আমার গৌরী, তাকে দাও আলোর শুশ্রূষা"।

নিছক নিসর্গ চিত্র মালাতে সাজিয়ে অলোকরঞ্জন কোনো কবিতা উপহার দেননি পাঠককে। তাঁর প্রজ্ঞান থেকে নেমে এসেছে সঘন নির্মাণ। কবি যখন বলেন—

"পুরুষ কবিকে সংহত দেখে ভয় পেয়ে যায় যম। তখন তা ব্যক্তিগত pathos কে ডিঙিয়ে অন্য আধ্যাত্মিক তাৎপর্য পেয়ে যায়। অলোকরঞ্জন মিষ্টিক কবি। তাঁর রচনাতে দৃশ্য-অদৃশ্যবোধের ঝিলমিল টানা থাকে। থাকে এক আঁধার ঘনতা, থাকে রহস্য জড়িত হাতছানি। এই পর্দা সরিয়ে কেবল ঋদ্ধ পাঠকই রসানুভূতি পান—

"নিয়ে গেলাম সব মাধুরী দিতে পারলাম না"। যৌবন বাউলেই দেখি এই কিছু না দিতে পারার বেদনা। জীবনের মাধুরীই কবির মাধুকরী হয়ে গেল। এখানেই তিনি শিল্পী ও কবির, ঋদ্ধতা অর্জন করেছেন।

কেবল নির্মিতি, চিত্রবিচিত্র শব্দের কাজ করা ঘেরাটোপ রচনায় অলোকরঞ্জনের বিশ্বাস নেই। প্রাণিক তাগিদে স্বতঃস্ফূর্ত যেটুকু সত্য সেটুকুই তিনি দিয়ে গেছেন সৎ ও সমানধর্মা পাঠককে। পাঠকের স্মৃতিতে ভাবীকালের জন্য সত্যের বীজ বপনের সাফল্য ও কৃতিত্বে তাঁর কবি ধর্ম উজ্জ্বল।

বিষয় বা উপাদান কে ছাড়িয়ে লক্ষণা ধর্ম, তাকে প্রকাশ করাই অলোকরঞ্জনের কাব্যের স্থাপত্যের মুন্সীয়ানা। শব্দ চয়ন অথবা তার সুষ্ঠু প্রয়োগে তিনি অনেক বেশী মৌলিক। "আমার বাড়ির বয়স" কবিতায় বলেছেন—

"বাড়ির কোলে হ্রদের সহজ অনার্দ্র আর্দ্রতা,

আমার বাড়ির বয়স কতটুকু?..."

এই "অনার্দ্র আর্দ্রতা" শব্দপ্রয়োগটি পাঠককে ক্ষণকালের জন্য বিভ্রান্ত করে। (Oxymoron) অক্সিমোরণের এমন কুশলতা নজিরবিহীন।

জীবনানন্দ বলেছেন—

"অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল,

অনেক কমলা রঙের রোদ (নগ্ন নির্জন হাত)

এখানে অলোকরঞ্জন এর ঋণ আছে—

"অনেক বন্ধু ছিল আমার...

অনেক বন্ধু ছিল"

প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যে এসব পংক্তি অত্যন্ত মৌলিক মনে হয়। একটা অবলীন চিত্রধর্ম এখানে সুপ্ত। অগ্রজ কবির প্রতি আনুগত্যে তা উজ্জ্বল,,, একে submerged image এর ব্যবহার বললে অত্যুক্তি হবেনা। অলোকরঞ্জনের art of personification (নরত্ব আরোপ) চমৎকার রূপ পেয়েছে কয়েকটি ছত্রে—

"দুই পাহাড়ের মধ্যে একটি আকাশ
বুকে নিয়ে আমি আর নীলকণ্ঠপুর
দুই পাহাড়ের খাদে সূর্য মৃত্যু গামী। (পান্থশালা- নীলকণ্ঠ পুর)

একটি আকাশকে বুকে নিয়ে তিনি সূর্যকে মৃত্যু গামী হতে দেখেছেন।জড় প্রকৃতিকে এই প্রাণময় সত্তায় উত্তীর্ণ করার মহিম নিপুণতা অলোকরঞ্জন কে কবিত্বের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

'নিষিদ্ধ কোজাগরী' এক অনন্যপূর্ব আস্বাদ এনে দেয়। এই কাব্যে অলোকরঞ্জন জীবন-মৃত্যু আত্মা ঈশ্বর নিয়ে পাঠককে অন্যভূমিতে এনে ফেলেছেন। কবি নাম কবিতায় কতকটা যেন বেশী জীবনমুখী। পাওয়া না পাওয়ার ফাঁকে আভাসিত হয়ে চলে যে সনাতন নাটক, তা নিতান্তই ঈশ্বর প্রণোদিত বলে কবি মনে করেছেন। সে নাটক অসময়ে নিষ্ঠুরভাবে শেষ হয়ে যাবে তা কবির নিতান্তই অনভিপ্রেত। আশ্চর্য এই যে এ কাব্যগ্রন্থের জীবন সম্পৃক্তি কবিকে ঈশ্বর-সমালোচক করেছে আর সেইসঙ্গে জীবনকে পূর্ণ বৃত্তে আবর্তিত করার মনোবাসনাও প্রকাশ করেছেন করি। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি—

"এই মুহূর্তে যে মানুষটি চলে যাচ্ছে আমি তাকে মন্ত্রের ভিতরে তুলে নিলাম/ ছন্নছাড়া— দেবো ওর চলন-বলনে ছন্দ যা থেকে কখনো কেউ ফিরতে পারে না, মৃত্যু সমতলে/ক্ষমা তা-ও দেবো, যেহেতু কখনো ক্ষমা পায়নি। /বুদ্ধের মতই প্রবুদ্ধ, সম্যগ চেতনায় প্রাত্যহিক যন্ত্রণা মুক্তিই যেন কাম্য কবির কাছে।

ভারতীয় দর্শনের নির্লিপ্ততা ও ভাবনা অলোকরঞ্জনের কাব্যবিষয়কে ঘিরে আবর্তিত।আবার পশ্চিম দুনিয়ার জীবনবোধকেও তিনি স্যালুট না করে পারেননি। বুদ্ধদেব ও তাঁর চেতনা তাই কবির আরাধ্য। তবু বলবো খেলা শেষ করে শীঘ্র চলে যাওয়ার আর্তিতে অলোক-দর্শন প্রভাস্বর। অদ্ভুত জীবন সম্পৃক্ত জিজ্ঞাসা তাঁর কবিতার ছত্রে—

"...সে মলাট যদি যেতো টুটে
তবে কি রবীন্দ্রনাথ মরতেন না শমীর মৃত্যুতে? (জল ভূমন্ডল আত্মা)।

আত্মার নির্বস্তুক অস্তিত্বকে মেনেছে ভারতীয় দর্শন। অলোকরঞ্জনের আত্মা সম্পর্কিত চিন্তা কিছু ভিন্ন পথে চলেছে। আত্মার আদি-অন্তহীন অস্তিত্বকে মানব জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন কবি। এ অতি অভিনব বোধ।

দেবদেবীর পূজা প্রকরণ রহিত এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বোধ। তিনি বিশ্বাসী। তিনি (Pantheism) প্যান্থেইজমকে গ্রহণ করেছেন। তার সঙ্গে ভারতীয় বোধ মিশেছে বলে কবি বলতে পেরেছেন স্বচ্ছন্দে—

"মাঝে মাঝে স্পষ্ট করে বলা দরকার
ঈশ্বর আছেন,
মগডালে-বসে থাকা পাপিয়াকে আর
পর্যবসিত বস্তু পৃথিবীকে স্নান করাচ্ছেন,,,,,"

কবির সত্য নিষ্ঠাই কাম্য। সে কথা রুগ্ন পৃথিবীকে বলে গেছেন কবি নিজস্ব ভাষায়—

"উপন্যাস লেখকরা সবচেয়ে ভীতু, ভূমিকায়
এখনো লেখেন, গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্রগুলি সবি
কাল্পনিক, স্থান, কাল মনগড়া নিতান্ত লিচ্ছবি
অত্যন্ত অতীতে"—

"রক্তাক্ত ঝরোকা"তে একটি তীব্রবেদনঘন ইমেজের বিমূর্ত উদ্ভাস দেখি। স্বপ্নের মত ছবি সব পাশাপাশি ধরা। উপসংহারে সহজ করে যা বলেছেন তা আমাদেরই সহজপাঠ—

"হরিণ সুন্দর পাখি, যে পাপী অনপণেয়, চোরে
নিয়ে গেছে যে নারীর বহিরঙ্গ, তীব্র একরোখা,
ক্ষুধার্ত বালক ভাসে নির্বাণের সুনীল সাগরে,
বাতিঘরে হেমন্ত নিশীথসূর্য রক্তাক্ত ঝরোখা"।

কবি এখানে অত্যন্ত নিপুণতায় cluster image ব্যবহার করেছেন। কথাগুলো এখানে নিবিড়,ঘননিবদ্ধ ও হৃদয়ের খুব কাছাকাছি। ১৯৬৭ থেকে ৭১এর রাজনৈতিক অস্থিরতা অলোকরঞ্জনকে স্পর্শ করেনি এমন অভিযোগ অনেক আলোচক করেছেন। আমরা মনে করি তাঁর কবি স্বভাবটি এই উত্তরাধিকার নিয়েই এসেছে। যেমন তিন বন্দ্যোপাধ্যায় এর মধ্যে বিভূতিভূষণ একেবারে স্বতন্ত্র ছিলেন, নিজস্বতায়। ওই রাজনৈতিক অস্থির কালেও সংযতচিত্ত অলোকরঞ্জন যখন লিখছেন তখন দেখলাম গৃহ অভিমুখী মেদুরবোধ ছেয়ে ফেলেছে কবির লেখনকে—

"তোমার প্রসাধনের ঝাঁপি আমি হারিয়ে ফেলেছি
অরণ্যের অন্ধকারে পেয়ে গেছি দেশজ, খালুই
ভরে এনেছি আমার গোপন সুন্দরবন,,," (কালোবেরী)

এসব কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে প্রত্যাবর্তনের সুর। কবির সচেতন নস্টালজিয়া।

কালের ভাঙ্গন ও গড়নের প্রভাবে কবিসত্তায় ও তাঁর লেখনে এবং ভাষার প্রকাশে ভঙ্গিমাটি বদলেছে। গ্রীক মিথ কে কবিতায় এনেছিল যারা—রেসিয়াস, জিউস, হেরার তারা কিন্তু অন্য ভাষায় চিত্রিত। রেমব্রান্টের ছবির গাঢ় বিষণ্ণ আচ্ছন্ন তীব্র শিখা ''কবির কলমে হয়েছিল দীপ্র,প্রভাস্বর উচ্চকিত।

এর পরেই অলোকরঞ্জন আবার ফিরলেন সহজ ছন্দে সহজ সুরে—,

''নারী যেমন বুক অথবা গ্রীবা তো নয়
বিবাহ বার্ষিকী যেমন বিবাহ নয়
প্রেম সেরকম মুগ্ধ প্রেমের কবিতা নয়
দেশটা যেমন কখনো নয় মন্ত্রণালয়''

(চলন বলন)

এ সহজ প্রকাশ প্রজ্ঞাজাত। অনায়াস তার চলা। স্বচ্ছন্দ তার বলা।

বস্তুনিষ্ঠা, বিতর্ক, দ্বেষ, পরনিন্দা কবিকে বিক্ষত করেছে। মানুষের মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া ও প্রকাশভাষ্যের মধ্যেও একটা নান্দনিক স্পর্শ থেকে যায় একথা অলোকরঞ্জন বলতে পেরেছেন। এ তাঁরই আবিষ্কার। এ সত্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন কবিতায়—

''তোমরা যখন আমাকে আক্রমণ করো তোমাদের মুখে শুভ্র সপ্রতিভতায় খই ফুটতে থাকে আর আমি আমার বিরুদ্ধে তোমাদের বক্তব্য ভুলে গিয়ে তোমাদের বাকরীতি নিসর্গের দিকে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি'' (আমার চলা বিপ্রতীপে)।

তর্কের চেয়ে ভালোবাসা অনেক বড়। শ্রদ্ধাহীন সমালোচনা নিতান্ত অমানবিক—এসব সত্য কবির আত্মপ্রত্যয়ের স্বাক্ষর।

অলোকরঞ্জন এক সমাহিত কালপুরুষ, এক পরিশুদ্ধচেতনার কবি যিনি কবিতাসাগর ও পাঠক হৃদয় মন্থন করতে সক্ষম হয়েছেন।তাঁর কবিতাতে কাব্যজগতের নির্জীবভাবটি শুদ্ধ হয়ে ফুটেছে নবযুগের নতুন সিদ্ধি। তাঁর কবিতা ভদ্রালক্ষ্মীর পূর্ণশ্রীতে মার্জিত।